উমরাহ সফরের গল্প

আরিফ আজাদ

সুকুন পাবলিশিং

সূচিপত্র

লেখকের কথা ৯

আমি যদি আরব হতাম ১২

যেখান থেকে শুরু ১৫

স্বপ্নমুখর দিন ২০

রাসুল আরাবির দেশে ২৫

মেঘমালা! মেঘমালা! ৩০

হে রাসুল, তোমাকে পাওয়ার দিনে ৩৫

সবুজ গম্বুজের ছায়ায় ৩৯

যেখানে নেমেছিল স্বপ্নের রাত ৪৭

সারি সারি সেতারা ৫৫

অপার্থিব সুরের ধ্বনি ৬০

তারা তবুও স্বপ্ন দেখে ৬৫

নানান রঙের মানুষ ৭১

মুগ্ধতার মোহনায় ৭৭

নক্ষত্রের নগরীতে একদিন ৮২

কোথা হে নরমদিল! ৮৯

কুবার আঙিনায় কিছুক্ষণ ৯৫

উহুদ, আমি তোমাকে ভালোবাসি ১০২

আলবিদা, মদিনা ১১০

দ্য রোড টু মক্কা ১১৫

আমি হাজির হে আল্লাহ, আমি হাজির! ১১৮

স্বপ্ন যখন পৌঁছে গেল মনজিলে........ ১২৫
মাতা হাজরার স্মরণে........ ১৩৬
হাশিমি বংশের বাবা........ ১৪৬
স্বপ্ন ছোঁয়ার গল্প........ ১৫৮
তুমি দেখতে আবু বাকারের মতো........ ১৬৪
মুহাম্মাদ, আমার আরবের বন্ধু........ ১৭২
তবু যেতে দিতে হয়........ ১৭৯

আমি যদি আরব হতাম

আমি যদি আরব হতাম, মদিনারই পথ
এই পথে মোর চলে যেতেন নূর নবি হজরত

বিদ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা দুটো চরণ। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসা গান, কিন্তু কেন তিনি আরব হতে চাইতেন, কেন মদিনার ধূলিধূসরিত পথ হওয়ার অদম্য বাসনা লালন করতেন মনে, সেটা উপলব্ধি করতে পারতাম না। সময়ের পরিক্রমায় বড় হয়েছি। ইসলামের ইতিহাসের নানান উৎসস্থল থেকে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে নবিজি সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী। জেনেছি আরবদের ঐতিহ্য, চিনেছি সাহাবাদের মতো সোনারটুকরো মানুষগুলোকে।

যতবার সীরাতের পাতায় অবগাহন করেছি, ঠিক ততবারই একটা প্রবল অপূর্ণতা এসে অন্তরে ঝেঁকে বসেছে। চৌদ্দ'শ বছর আগের মদিনা শহরের সেই কুপি বাতির আলোয়, ধূলিধূসরিত গোধূলি আর মরু-ঝড়ের মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করার বড্ড শখ জেগেছে। আমার ভারি ঈর্ষা হয় সাহাবাদের প্রতি—কতই না সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন তারা! নবিজির কত কাছাকাছি, কত পাশাপাশি তারা থাকতে পেরেছেন। যেদিন মদিনায় প্রথম এলেন নবিজি, সাহাবি আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে উঠেছিলেন। আমি শুধু আবু আইয়ুব আনসারি

রাসুল আরাবির দেশে

[১]

জেদ্দা বিমানবন্দরে যখন নামি, তখন প্রায় সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। অন্ধকারেরা যেন অধীর অপেক্ষায়—বাতাসে মুয়াযযিনের আযান ভেসে এলেই তারা নিজেদের ঘন আবরণে চারিপাশ আবৃত করে নিবে। আমার চোখেমুখে তখন স্বপ্ন পূরণের বিভা; এ যেন এক জাদু পরাবাস্তবের দুনিয়া—যা কিছু ঘটছে তার সবটাই ভ্রম! যেন আমি হারিয়ে গিয়েছি এক গভীর স্বপ্নের অতলে—চোখ মেললেই মিলিয়ে যাবে এই কোলাহল, ছুটোছুটি, হইচই। গল্পের জাদুকর যেভাবে মায়াভ্রম তৈরি করে স্বপ্নলোক বানায়, আমিও যেন ঢুকে পড়েছি তেমনই এক স্বপ্নলোকে।

জীবনে কিছু কিছু মুহূর্ত আসে যে মুহূর্তগুলোকে খুব করে অনুভব করতে হয়। ঘড়ির প্রতিটা সেকেন্ড, হৃদপিণ্ডের প্রতিটা নড়াচড়া এবং চোখের প্রতিটা পলক খরচ করতে হয় খুব সযতনে। রাসুল আরাবির দেশে পৌঁছে আমি যেন আটকে গেলাম এমনই এক মায়াবী মুহূর্তের মায়াজালে। সম্পূর্ণ নতুন একটা দেশ, কিন্তু কী অদ্ভুত আবেশে এই ভূমি আমাকে ডেকে চলেছে—'আয় আয়' বলে!

চারদিক প্লাবিত করে একসময় ভেসে এলো আযানের সুমধুর সুর। তাওহিদের দেশে নিজ কানে আযান শুনতে পাওয়ার সেই আনন্দ

অবর্ণনীয়! আযানের সাথে সাথে প্রকৃতিও যেন সজাগ হয়ে উঠল—ঝুপ করে নেমে এলো একরাশ গভীর কালো অন্ধকার। যদিও বিমানবন্দরের বাহারি আলোকসজ্জার কাছে সেই অন্ধকার নিদারুণ পরাজিত, কিন্তু আসমানে তারাদের ঝলমল উপস্থিতি দেখে বুঝে নেওয়া যায়—রাত নেমেছে।

তারপর, সদলবলে অথবা একা—রোযাদারেরা মেতে উঠলেন ইফতার আয়োজন নিয়ে। একটা পবিত্র আবেশ যেন হুড়মুড় করে ছড়িয়ে পড়ল সবখানে।

আমরা ইফতার করেছি বিমানবন্দরের বাইরের করিডোরে। একটা খেজুর আর তিন চুমুক পানি পান করে সটান দাঁড়িয়ে গেলাম মাগরিবের সালাত আদায়ের জন্য। একটার পর একটা জামাত হচ্ছে। ইফতারি আর সালাতের ব্যতিব্যস্ততায় মুখরিত হয়ে উঠল পুরো বিমানবন্দর এলাকা।

যে এজেন্সির সাথে এসেছি তাদের পরিকল্পনাটা আগেই জেনেছিলাম। আমাদের যাত্রাটা সাজানো ছিল এভাবে—ঢাকা থেকে জেদ্দা, জেদ্দা থেকে মদিনা, মদিনা থেকে মক্কা, মক্কা থেকে জেদ্দা হয়ে পুনরায় ঢাকা। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু প্রস্তুত করে রাখা হলো। টিম লিডার এসে বললেন দ্রুত প্রস্তুতি নিতে। মদিনাগামী বাস আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে বাইরে।

খানিক বাদেই আমাদের বাস ছাড়ল। আমরা রওনা করলাম সবুজ গম্বুজের দেশে। সেই পবিত্রভূমির উদ্দেশ্যে যেখানে ভিত গড়েছিল দুনিয়ার সবচেয়ে অনিন্দ্য সভ্যতার। যেখানে জীবনের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিলেন শুভ্র আর শুদ্ধতার সবটুকু নিয়ে জন্মানো ধরণির পবিত্রতম মানুষটি। পৃথিবীর সমস্ত পবিত্রতা, আকুলতা আর আবেদন যেখানে এসে জড়ো হয়েছিল একদা।

আমার একটু মন খারাপ হলো। সেদিন এমন অন্ধকার জমেছিল প্রকৃতিতে, চোখের সামনে ধরলে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। এমন নিকষ কালো অন্ধকারে ছেঁয়ে আছে চারপাশ। বাসে করে জেদ্দা থেকে মদিনা যেতে প্রায় ছয় থেকে সাত ঘণ্টা সময় লাগে। এত লম্বা একটা পথ পাড়ি দেবো শুধু অন্ধকার দেখতে দেখতেই? চলতি পথে পার করব কত কত জায়গা যেখানে হয়তো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে নবিজি সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্মৃতি। হয়তো এইসব অলিগলি পথ ধরে একদা হেঁটে যেতেন রাসুলের সাহাবিরা। কোথায় নবিজির কোনো স্মৃতি লুকিয়ে আছে তা নাহয় না-ই জানলাম, কিন্তু মরুভূমির উঁচু-নিচু পাহাড়গুলো, অথবা বিস্তৃত বিরান মরুভূমি—এসব দেখতে পাওয়াও তো চোখের শান্তি! এইসব দৃশ্য দেখতে দেখতে সেই চৌদ্দ'শ বছর আগের ঘটনাগুলোর রোমন্থনে ডুব দেওয়া যেত। কিন্তু সেদিন এমন ঘনঘোর প্লাবিত অন্ধকার নেমেছিল যে—আমার মন খারাপ না হয়ে উপায় কী! তবুও শুকরিয়া যে রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্টগুলো ছিল। তাদের প্রতিফলিত আলোয় কাছাকাছি থাকা মরুভূমির কিছু অনুচ্চ পাহাড়, বিস্তৃত বিরান প্রান্তরের কিছু অংশ দেখতে দেখতে আসতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ।

[২]

পথ চলতে চলতে যখন মদিনার কাছাকাছি চলে এলাম, আমার সারা শরীরজুড়ে তখন স্বপ্ন পূরণের শিহরণ। মদিনার উপকণ্ঠে প্রবেশ করতেই মনে হলো—যেন আমি এক অতিআশ্চর্য স্বপ্নরাজ্যের ভেতর ঢুকে পড়ছি!

মদিনা শহরের চোখ ঝলসে দেওয়া আভিজাত্য নেই। গাড়ির ভেতর থেকে যতদূর চোখ যায় কেবল গাঢ় অন্ধকার এবং তার মাঝে স্তূপাকার হয়ে থাকা কালো কালো পাহাড় ছাড়া দৃষ্টিসীমার মাঝে আর কিচ্ছু দেখা

আলবিদা, মদিনা

ভোরে উদিত হওয়া সূর্য সন্ধ্যাবেলায় অস্ত যায়। সকালে নীড় ছেড়ে যাওয়া পাখি নীড়ে ফেরে সন্ধ্যায়। জাগতিক জীবনে শুরু আছে এমন সকল ঘটনার সমাপ্তিও অবশ্যম্ভাবী। ফলে, মদিনায় আমার স্বপ্নময় দিনগুলোও ফুরিয়ে এলো।

প্রিয় কাউকে ছেড়ে যাওয়ার আগে অশ্রুসজল চোখে বারবার পেছন ফিরে তাকানো, খানিক এগিয়ে গিয়ে পুনরায় থমকে যাওয়া, আবার পেছন ফিরে তাকানো, হৃদয়ের সমস্ত আকুতি সমেত দৌড়ে তার কাছে ফিরে আসতে চাওয়া, তাকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কাঁদবার অভিলাষ—মাসজিদ আন নববিকে ছেড়ে আসার দিন এ-সমস্তটাই ছিল আমার অনুভূতি। বিয়োগব্যথার এমন অব্যক্ত যন্ত্রণা, এমন হাহাকার করা শূন্যতা হৃদয়ে আগে কখনো অনুভব করিনি।

এখানকার প্রতিটা ইট যেন আমার অতি আপন। প্রতিটা বালুকণা যেন জীবন্ত হয়ে কথা বলত আমার সাথে। এই তল্লাট, মাঠঘাট, খেজুর বাগান, এখানকার রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন আর বৃষ্টিভেজা মুহূর্তগুলোর সাথে যেন আমি যুগ যুগ ধরে পরিচিত। মদিনার বাতাস এত স্নিগ্ধ, এত নির্মল যে, মনে হতো জান্নাতের সীমানা মাড়িয়ে একটুকরো পরান জুড়ানো শীতল হাওয়া এসে গায়ে মাখামাখি হচ্ছে। মদিনার আকাশ,

সেই আকাশের মেঘ কিংবা রাত্রিবেলার তারকারাজি—সমস্তটাই যেন এক কল্পরাজ্যের সাজানো ঘটনা।

হেঁটে হেঁটে আমি দেখতাম মদিনা শহরকে। মাসজিদ আন নববির খোলা চত্বরটা ছিল আমার ভীষণ প্রিয় জায়গা। এই চত্বরে হেঁটে বেড়াতে দারুন ভালো লাগত। যেখানে ইচ্ছে হতো বসে পড়তাম। সালাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, যিকির-আযকার করা। আবার হাঁটতে মন চাইলে উঠে হনহন করে হাঁটা ধরতাম। হেঁটে হেঁটে দেখতাম এই গলি থেকে ওই গলি, এই চত্বর থেকে ওই চত্বর, এই পাশ থেকে ওই পাশ। মাসজিদ আন নববির চারপাশ হেঁটে দেখতে আমার কী যে ভালো লাগত! মনে হতো একটা জাদুর গালিচা বিছানো আমার পায়ের নিচে, আর আমি হেঁটে হেঁটে দেখছি জান্নাতের সুরম্য দালানকোঠা, সুবিন্যস্ত সজ্জা, আলোকোজ্জ্বল প্রদীপমালা।

এখন তো সবখানে টাইলস আর কার্পেট মোড়ানো, কিন্তু আল্লাহর রাসুলের সময়ে এসব ছিল না। তখন ছিল পাথুরে শক্ত মাটি। এখানে-ওখানে পাথরের ঢিবি। জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল খেজুর গাছ। দখিনা বাতাসে দোল খেতো সেসব গাছের ডাল।

এই পাথুরে শক্ত মাটিতে, শুকনো খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে বসে থাকতেন আমার রাসুল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দূরে দূরে সাহাবাদের ঘরদোর। সেই ঘরগুলোর অধিকাংশও খেজুর পাতার চাটাইয়ে তৈরি। তাদের ঘরের দরোজায় ঝুলতো একফানা লম্বা কাপড়, যাতে বাইরের কারো দৃষ্টি ঘরের মধ্যে আসতে না পারে। আশেপাশে ছিল পানির কুয়ো। যে যার মতো করে উঠাচ্ছে পানি। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে উট কিংবা বকরির পাল। কেউ হয়তো বেরিয়েছে ব্যবসার উদ্দেশ্যে, অথবা কোনো রাখাল হয়তো দূরের কোনো প্রান্তরে চরিয়ে আনতে যাচ্ছে তার পশুগুলো।

সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি না-ও দেখো, ধরে নিবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাকে দেখছেন।'

ধরে নিন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বলুন তো, দুনিয়ার আর কোনো চিন্তা, আর কোনো ভাবনা এসে আপনার মনের জায়গা দখল করতে পারবে? বিশ্বজাহানের অধিপতিকে সামনে রেখে দুনিয়ার আর কোনো বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া আদৌ কারও পক্ষে সম্ভব?

কিন্তু দেহ, মন আর চিন্তার এই সমন্বয়ের জন্য যে প্রস্তুতিটুকু দরকারি, প্রতি ওয়াক্ত সালাতের আগে সেই প্রস্তুতি আমরা কয়জন নিতে পারি? মাগরিব ব্যতীত, আযান শোনামাত্র আমাদের কয়জন হাতের কাজ ছেড়ে সালাতের জন্য উঠে পড়ি? ব্যস্ততা, হুলস্থুল আর দৌড়ঝাঁপ মাথায় নিয়ে আমরা সালাতের কাতারে গিয়ে দাঁড়াই। সেই সালাতে আমাদের না থাকে মনোযোগ আর না থাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি কেন্দ্রীভূত কোনো চিন্তা।

যুল হুলাইফা থেকে ইহরাম গায়ে জড়িয়ে, তালবিয়্যাহ পাঠ করতে করতে সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে মক্কায় প্রবেশের ঘটনা থেকে এই শিক্ষাটাও আমি গ্রহণ করলাম যে—আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের ঘটনাগুলো আকস্মিক নয়, এগুলোর জন্য দরকার প্রস্তুতি আর অন্তরের সংযোগ।

মধ্যখানে যাত্রাবিরতি করে আমাদের গাড়ি। রাস্তার ধারে থাকা একটা সুপারশপ থেকে নিজ নিজ ইফতার কিনে নিয়ে, পাশে থাকা সালাতের জায়গায় এসে বসে পড়লাম। আযানের খুব বেশি দেরি নেই। সবখানে সীমাহীন ব্যস্ততা। মরুভূমির লু হাওয়ার গা ভেদ করে একসময় কানে এসে লাগে আযানের সুমধুর ধ্বনি। 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লালল্লাহ' এর ধ্বনি মুহূর্তে ছড়িয়ে গেল গোটা বালুকাময় প্রান্তরে।

মক্কায় পৌঁছে ইশার সালাত ধরতে পারার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। শুধু ইশার সালাত নয়, তারাবিহর সালাত ধরতে পারাও মুশকিল হয়ে

যাবে। সিদ্ধান্ত হলো—মাগরিব এবং ইশা আমরা এখানে জড়ো করে (পর পর আদায় করে) নেবো। ইফতার সেরে, দুটো আলাদা আলাদা জামাআতে মাগরিব এবং ইশার সালাত আদায় করে আমরা পুনরায় গাড়িতে চেপে বসলাম। গাড়ি চলতে শুরু করেছে ঝড়ের গতিতে। হৃদয়ের সমস্ত আবেগ একত্রিত করে আমরা আওড়ে চলেছি হাজার বছরের পুরোনো এক সফর সংগীত—

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক।
লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি'মাতা, লাকা ওয়াল মুল্ক,
লা শারীকা লাক...

হাশিমি বংশের বাবা

মক্কার দিনগুলো মদিনার মতোই চমৎকার কাটছে। সারাদিনমান কেটে যায় মাসজিদ আল হারামের মাঝে। রামদান মাস হওয়াতে আরও সুবিধে—দিনের বেলায় খাওয়া দাওয়ার কোনো চিন্তা নেই। ফযর পড়ে হোটেলে যাওয়া, ঘণ্টা তিন বা চারেকের ঘুম, তারপর আবার মসজিদে চলে আসা। জাগতিক জীবনের এমন আখিরাত-কেন্দ্রিক যাপনপদ্ধতি সত্যিই উপভোগ্য। চারদিকে মানুষের বিরামহীন দৌড়ঝাঁপ, আমল নিয়ে ব্যতিব্যস্ততা, আকুল মুনাজাতের দৃশ্য দেখতে দেখতে পাথরসম হৃদয়ও মোমের মতো গলে যেতে বাধ্য।

দুনিয়াতে আমার বন্ধু আছেন অনেকজন। কিন্তু, সরাসরি সাক্ষাৎ আছে এমন বন্ধুর সংখ্যা নেহায়েত কম। আমার সেই কম সংখ্যক বন্ধুদের একজন থাকেন সৌদি আরবের রিয়াদে। ব্যবসাপাতি নিয়ে এখানে তার পঁচিশ বছরের প্রবাস-জীবন। আমার উমরাহ করতে আসার সংবাদে তার মনে ছিল উপচে পড়া খুশি আর আনন্দ। মক্কা থেকে রিয়াদ বহু দূরের পথ। গাড়িতে করে আসতে নয় দশ ঘণ্টার মতোন সময় লাগে। এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিনি মক্কা চলে এসেছেন আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য।

আমার সেই বন্ধু একদিন আমাকে মক্কা শহর ঘুরে দেখাতে চাইলেন। মদিনার মতো মক্কাও অত্যন্ত স্মৃতিবহুল জায়গা। মদিনায় যেদিকে চোখ যায় শুধু অলিগলি। তবে মক্কা তেমনটা নয়। এখানে অলিগলি তেমন নেই। মক্কা পুরোটাই পাহাড়ে ঘেরা জায়গা। ঘরদোরগুলোও পাহাড়ের কোলঘেঁষা কিংবা পাহাড়ের উপরে। কিন্তু মক্কা তো সেই জায়গা যেখানে আল্লাহর রাসুল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন। মক্কা তো সেই জায়গা যেটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাছাই করেছেন ইসলামের সূচনাকেন্দ্র হিশেবে। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এখানেই রেখে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী আর সন্তান। দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে পবিত্র ইবাদাতগৃহটাই মক্কাতে। মক্কার এই ভূমি জন্ম দিয়েছে আবু বাকার, উমার, উসমান, আলি, খালিদ ইবন ওয়ালিদ, আবদুর রহমান ইবনে আউফসহ অসংখ্য অগনিত নক্ষত্র-মানুষ। রাদিয়াল্লাহু আনহুম। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাসহ কতশত মহীয়সী নারীগণ মক্কার এই আলো-হাওয়া-জলে বেড়ে উঠেছেন। জান্নাতুল মুয়াল্লা নামের সেই কবরস্থান, যেখানে শুয়ে আছেন আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাসহ অসংখ্য মহাত্মা মানুষজন, সেই পবিত্র জায়গাটাও এই মক্কা শহরে অবস্থিত। সবচেয়ে বড় কথা—এই মক্কাতেই নাযিল হয়েছিল পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন। সুতরাং, মক্কা শহরটাকে একঝলক ঘুরে না দেখাটা অপরাধ তো বটেই।

সকাল দশটার দিকে মাসজিদ আল হারামের পাশের একটি রাস্তায় এসে আমরা গাড়ি খুঁজতে লাগলাম। এখানকার বেশিরভাগ ড্রাইভার ভিনদেশি। পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান, মরোক্কান, ইয়েমেনিসহ নানান দেশের লোকজন এখানে গাড়ি চালায়। হাত নেড়ে আমার বন্ধু একটা গাড়িকে থামালেন। গাড়ির কাচ নামিয়ে ড্রাইভার জিগ্যেস করলেন, 'জিয়ারাহ?'

'হ্যাঁ।'

‘কতজন?’

‘দুইজন।’

‘যাবেন কোথায় কোথায়?’

‘এই ধরুন, জাবালে নুর, জাবালে রহমত, মিনা, মুযদালিফাহ হয়ে মাসজিদ আল হারামে ফিরে আসব।’

‘ঠিক আছে। ৪৫০ রিয়াল লাগবে।’

আমার বন্ধু দর কষাকষি করতে লাগলেন। কিন্তু না, ভদ্রলোক ৪৫০ রিয়ালের বাইরে আর কোনো প্রস্তাবেই রাজি নন। অগত্যা তাকে ‘আল্লাহ হাফিয’ জানিয়ে আমরা অন্যকোনো গাড়ি খুঁজতে লাগলাম। এখানে গাড়ির কোনো অভাব নেই। প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে গাড়ি পাওয়া যায়।

সাইড লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুব দ্রুত গতিতে আসা একটা গাড়ি স্পীড কমিয়ে আমাদের পাশে এসে ব্রেক করল। জানলার কাচ নামিয়ে তিনিও জিগ্যেস করলেন, ‘জিয়ারাহ?’

‘হ্যাঁ।’

‘আসুন আসুন।’

আসুন আসুন বললেই তো আর উঠে পড়া যায় না। এই দেশেও নানান ধরনের মানুষেরা আছে। কেউ ভালো, কেউ খারাপ। শহরটা মক্কা বলে এখানে যে কেবল নিপাট ভদ্রলোকেরা বাস করেন তা ভাবলে ভুল হবে। অপ্রীতিকরা ঘটনা এখানেও কম ঘটে না। অনেক ভাই-বন্ধু আর শুভাকাঙ্ক্ষীরাই এই বিষয়ে আমাকে সতর্ক করেছেন আসার আগে।

ড্রাইভারকে দেখে মনে হচ্ছে আরব কেউ হবেন। চেহারাটাও ভদ্রোচিত। চেহারা দেখেই কারও ব্যাপারে অনুমান করা যদিও দুষ্কর আজকালকার দুনিয়ায়, তবু চারপাশে কিছু মানুষ তো থাকেন যাদের চেহারায় সততা,

মহানুভবতা আর সত্যবাদিতার একঝলক আলো লেপ্টে থাকে, যেমনটা ছিল আমাদের রাসুল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায়। হিজরত করে যেদিন তিনি মদিনায় পা রাখলেন, মদিনার অধিবাসীদের সাথে তাঁকে দেখতে আসলেন আবদুল্লাহ ইবন সালামও। তিনি ছিলেন একজন ইহুদি পণ্ডিত। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থগুলোর যাবতীয় জ্ঞান ছিল তার নখদপর্ণে। দুনিয়ায় একজন সত্য নবির আবির্ভাব যে অত্যাসন্ন তা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। কিন্তু মদিনাবাসী অধীর হয়ে যার জন্য অপেক্ষা করে আছে, তিনিই যে সেই প্রতিশ্রুত শেষ নবি সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না আবদুল্লাহ ইবন সালাম। সত্যকে ধারণ করার বিষয়ে তার মাঝে কোনো দ্বিধা ছিল না। ফলে, মদিনাবাসীর সাথে নবিজিকে নিজ চোখে দেখার বাসনায় তিনিও ছুটে আসলেন। সেই প্রথম দর্শনেই নবিজি সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবন সালাম যে কথাটি বলেছিলেন তা হলো এই—

'এই চেহারা কোনো মিথ্যেবাদীর হতে পারে না।'[১]

এই ড্রাইভারকে দেখে আমাদেরও সেরকম ধারণা হলো। চেহারাটা কোনো মিথ্যেবাদী, ঠক আর প্রতারকের চেহারার মতো নয়। তারপরও আমার বন্ধু জিগ্যেস করলেন, 'ভাড়া কত?'

মিষ্টি হেসে তিনি বললেন, 'দিলেন নাহয় একশো রিয়াল।'

একটু আগেই একজন চারশ পঞ্চাশ রিয়াল চেয়ে গেল। আর এই লোক কী না ভাড়া চাচ্ছে কেবল একশ রিয়াল! মাসজিদুল হারাম থেকে জাবালে নুর তথা হেরা গুহা হয়ে অনেকগুলো জায়গা ঘুরিয়ে আমাদের আবার রেখে যাবে এখানে। সৌদি আরবে যারা ঘুরাঘুরি করেন তাদের জানবার কথা যে—ভাড়াটা একেবারেই নামকাওয়াস্তে। একবার মনে হলো—লোকটার কোনো মতলব নেই তো?

[১] সুনানুত্ তিরমিযি, হাদিস : ২৪৮৫